ব্যাকরণ

প্রশ্ন: ণ-ত্ব বিধান কাকে বলে? ন-ত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম লেখো।

উত্তর: ণ-ত্ব বিধান: যে নিয়মে দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' -তে পরিণত হয়, তাকে ণ-ত্ব বিধান বলে। ণ-ত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম:

১. ঋ, র, ষ–এই তিনটি বর্ণের পর তৎসম শব্দের দন্ত্য 'ন' মূধন্য 'ণ' হয়। যেমন: ঋণ, ঘৃণা, রণ, বর্ণ, ভূষণ ইত্যাদি।

২. ঋ, র, ষ-এর পর স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, ষ, হ অথবা ং (অনুস্বার) থাকলে তার পরবর্তী দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন: লক্ষণ, ভক্ষণ, রেণু, পাষাণ, নির্বাণ, দর্পণ, গ্রহণ ইত্যাদি।

৩. ট বর্গের পূর্বে দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন: বণ্টন, লুণ্ঠন, খণ্ড ইত্যাদি।

৪. প্র, পরা, পরি, নির–এই চারটি উপসর্গের পরবর্তী দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হবে। যেমন: প্রণাম, প্রমাণ, পরায়ণ, পরিণতি, নির্ণয় ইত্যাদি।

৫. ত, থ, দ, ধ-এর পূর্বে সংযুক্ত বর্ণে দন্ত্য 'ন' হয়, 'ণ' হয় না। যেমন: দৃষ্টান্ত, বৃন্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন, বন্ধন ইত্যাদি।

প্রশ্ন: ষত্ব বিধান বলতে কী বোঝো? ষত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম লেখো।

উত্তর: যে বিধানে তৎসম শব্দে 'ষ' -এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে ষত্ব বিধান বলে। নিচে ষত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম দেওয়া হলো:

১. অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি এবং ক-র এর পর ষ-এর প্রয়োগ হলে তা অবিকৃত থাকে। যেমন: ভীষণ, বিমর্ষ, জিগীষা ইত্যাদি।

২. ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতগুলো ধাতুতে 'ষ' হয়। যেমন: অভিষেক, অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

৩. ঋ-কার ও র-এর পর 'ষ' হয়। যেমন: বৃষ, কৃষ্টি ইত্যাদি।

৪. ট ও ঠ-এর আগে মূর্ধন্য 'ষ' হয়। যেমন: পুষ্টি, সৃষ্টি।

৫. নিঃ, দুঃ, বহিঃ, আবিঃ, চতুঃ প্রাদুঃ–এ শব্দগুলোর পর ক, খ, প, ফ থাকলে বিসর্গ-এর স্থানে 'ষ' হয়। যেমন: নিষ্ফল, নিষ্কাম, বহিষ্কার ইত্যাদি।

প্রশ্ন: বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম লেখো।

উত্তর: বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত প্রমিত বাংলা বানানের দুটি নিয়ম নিচে দেওয়া হলো:

১. রেফের পরে ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব হয় না। যেমন: ধর্ম, কর্ম, গর্ব ইত্যাদি।

২. সন্ধিতে ম্ স্থানে ং বিকল্প ঙ হয়। যেমন: অহম+কার = অহংকার; সম+গতি = সংগতি, সঙ্গতি।

৩. ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধানের নিয়মগুলো কেবল সংস্কৃত থেকে আগত তৎসম শব্দের বেলায় প্রযোজ্য। যেমন: ঋণ, বর্ণ, ভূষণ ইত্যাদি তৎসম শব্দ। দেশি, বিদেশি ও মিশ্র শব্দে ণ ও ষ ব্যবহৃত হবে না। যেমন: জার্মান, স্টোভ ইত্যাদি।

৪. জাতি, ভাষা, পেশা, প্রাণী, বস্তু, কর্মবাচক শব্দ এবং দ্বিরাবৃত্ত শব্দে কেবল ই-কার হয়। যেমন: বেজি, কেরানি ইত্যাদি।

৫. বাংলা শব্দে 'হস' চিহ্ন দেওয়ার দরকার নেই। তবে ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকলে 'হস' চিহ্ন ব্যবহার করা বিধেয়। যেমন: আল্লাহ্, শাহ্ ইত্যাদি।

৬. বিদেশি শব্দে ‘ষ’ হবে না। মূল উচ্চারণ অনুযায়ী শ, স হবে। যেমন: জিনিস, মসলা, শরবত ইত্যাদি।

বিরাম চিহ্ন বা যতি চিহ্ন বা ছেদ চিহ্ন

বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্য বাক্য উচ্চারণের সময় বাক্যের মাঝে ও শেষে বিরতি দিতে হয়। এই বিরতির পরিমাণ প্রয়োজন অনুযায়ী কম-বেশি হয়ে থাকে। আবার বাক্য উচ্চারণের সময় বিভিন্ন আবেগের জন্য উচ্চারণ বিভিন্ন হয়ে থাকে। বাক্যটি লেখার সময় এই বিরতি ও আবেগের ভিন্নতা প্রকাশ করার জন্য যেই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হয়, তাদেরকে বিরাম চিহ্ন বা যতি চিহ্ন বা ছেদ চিহ্ন বলে।

প্রাচীন বাংলায় মাত্র দুইটি বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করা হতো, দাঁড়ি (।) ও দুই দাঁড়ি (॥)। পরবর্তীতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইংরেজি ভাষার অনুকরণে বাংলায় আরো অনেকগুলো বিরাম চিহ্ন প্রচলন করেন। বর্তমানে ব্যবহৃত বিরাম চিহ্নগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিরাম চিহ্ন নিচে দেয়া হলো-

যতি চিহ্নের নাম	আকৃতি	বিরতির পরিমাণ
কমা	,	১ বলতে যে সময় লাগে
দাঁড়ি/ পূর্ণচ্ছেদ	।	এক সেকেন্ড
জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নসূচক চিহ্ন	?	এক সেকেন্ড
বিস্ময়সূচক বা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন	!	এক সেকেন্ড
ড্যাস	–	এক সেকেন্ড
কোলন ড্যাস	:-	এক সেকেন্ড
কোলন	:	এক সেকেন্ড
সেমি কোলন	;	১ বলার দ্বিগুণ সময়
উদ্ধরণ বা উদ্ধৃতি চিহ্ন	‘ ’/ “ ”	এক সেকেন্ড
হাইফেন	–	থামার প্রয়োজন নেই
ইলেক বা লোপ চিহ্ন	’	থামার প্রয়োজন নেই
বন্ধনী চিহ্ন	( )	থামার প্রয়োজন নেই
	{ }	
	[ ]	
দুই দাঁড়ি	॥	
ত্রিবিন্দু বা ত্রিডট	…	

বিরাম চিহ্নের ব্যবহার

কমা (,)

বাক্য সুস্পষ্ট করতে বাক্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগের মাঝে কমা বসে। যেমন- সুখ চাও, সুখ পাবে বই পড়ে।

পরস্পর সম্পর্কিত একাধিক বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ একসঙ্গে ব্যবহৃত হলে শেষ পদটি ছাড়া প্রতিটির পরে কমা বসে। যেমন- ১৬ ডিসেম্বর আমাদের মন সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, ভালবাসা, আনন্দে ভরে থাকে।

সম্বোধনের পরে কমা বসে। যেমন- রশিদ, এদিকে এসো।

জটিল বাক্যের প্রত্যেকটি খন্ডবাক্যের পরে কমা বসে। যেমন- যে পরিশ্রম করে, সেই সুখ লাভ করে।

কোন বাক্যে উদ্ধৃতি থাকলে, তার আগের খন্ডবাক্যের শেষে কমা (,) বসে। যেমন- আহমদ ছফা বলেন, 'মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ।' তুমি বললে, 'আমি কালকে আবার আসবো।'

মাসের তারিখ লেখার সময় বার ও মাসের পর কমা বসে। যেমন- ২৫ বৈশাখ, ১৪১৮, বুধবার।

ঠিকানা লেখার সময় বাড়ির নাম্বার বা রাস্তার নামের পর কমা বসে। যেমন- ৬৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১০০০।

ডিগ্রী পদবি লেখার সময় কমা ব্যবহৃত হয়। যেমন- ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, এম,এ, পি-এইচ,ডি।

সেমিকোলন (;)

কমা-র চেয়ে বেশি কিন্তু দাঁড়ি-র চেয়ে কম বিরতি দেয়ার জন্য সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন-
আমরা সবাই সবাইকে ভালবাসি; আসলেই কি সবাই ভালবাসি?

এক ধরনের বাক্যন্তর্গত চিহ্ন
একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একটি বাক্যে লিখলে সেগুলোর মাঝখানে সেমিকোলন বসে
বক্তব্য স্পষ্ট করার জন্য সমজাতীয় বাক্য পাশাপাশি প্রতিস্থাপন করলে সেমিকোলন বসে

দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ (।)

প্রতিটি বাক্যের[] শেষে দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়। দাঁড়ি দিয়ে বাক্যটি শেষ হয়েছে বোঝায়। যেমন-
আমি কাল বাড়ি আসবো।

প্রশ্নবোধক চিহ্ন(?)

প্রশ্নবোধক বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন-
তুমি কেমন আছ?

বিস্ময়সূচক বা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন(!)

বিস্মিত হওয়ার অনুভূতি প্রকাশের জন্য কিংবা অন্য কোন হৃদয়ানুভূতি প্রকাশের জন্য এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন-
আহা! কী চমৎকার দৃশ্য

ছি! তুমি এত খারাপ।
হুররে! আমরা খেলায় জিতেছি।

আগে সম্বোধনের পরেও বিস্ময়সূচক চিহ্ন ব্যবহার করা হতো। কিন্তু আধুনিক নিয়ম অনুযায়ী সম্বোধনের পরে কমা বসে। তাই পুরোনো লেখায় সম্বোধনের পরে বিস্ময়সূচক চিহ্ন থাকলেও এখন এটা আর লেখা হয় না। যেমন-
জননী! আজ্ঞা দেহ মোরে যাই রণস্থলে।

কোলন (:)
একটি অপূর্ণ বাক্যের পর অন্য একটি বাক্য লিখতে হলে কোলন ব্যবহার করতে হয়। যেমন- সভায় ঠিক করা হল : এক মাস পর আবার সভা অনুষ্ঠিত হবে।

ড্যাস (-)
যৌগিক ও মিশ্র বাক্যে দুই বা তারচেয়েও বেশি পৃথক বাক্য লেখার সময় তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে ড্যাস চিহ্ন ব্যবহার করা যায়। যেমন-

তোমরা দরিদ্রের উপকার কর- এতে তোমাদের সম্মান যাবে না- বাড়বে।

কোনো কথার দৃষ্টান্ত বা বিস্তার বোঝাতে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়
বাক্য অসম্পূর্ণ থাকলে বাক্যের শেষে ড্যাশ চিহ্ন বসে
গল্পে উপন্যাসে প্রসঙ্গের পরিবর্তন বা ব্যাখ্যায় ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়
নাটক বা গল্প-উপন্যাসে সংলাপের আগেও ড্যাশ চিহ্ন বসে

কোলন ড্যাস (:-)
উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত প্রয়োগের জন্য কোলন ড্যাস ব্যবহৃত হয়। যেমন-
পদ পাঁচ প্রকার :- বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া।

হাইফেন বা সংযোগ চিহ্ন(-)
সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখানোর জন্য হাইফেন ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, দুইটি পদ একসঙ্গে লিখতে গেলে হাইফেন দিয়ে লিখতে হয়। যেমন-
সুখ-দুঃখ, মা-বাবা।

ইলেক বা লোপ চিহ্ন
কোন বর্ণ লোপ করে বা বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ বোঝাতে ইলেক বা লোপ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। কবিতা বা অন্যান্য সাহিত্যে এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন-
মাথার ’পরে জ্বলছে রবি। (’পরে= ওপরে)
পাগড়ি বাঁধা যাচ্ছে কা’ রা? (কা’ রা = কাহারা)

উদ্ধরণ চিহ্ন

বক্তার কথা হুবুহু উদ্ধৃত করলে সেটিকে এই চিহ্নের মধ্যে রাখতে হয়। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ উক্তিকে এই চিহ্নের মধ্যে রেখে লিখতে হয়। যেমন-

ফিদেল ক্যাস্ত্রো বলেছেন, 'জন্মভূমি অথবা মৃত্যু' ।

ব্র্যাকেট বা বন্ধনী চিহ্ন ( ).{ }. [ ]

গণিতশাস্ত্রে এই তিনটির আলাদা গুরচত্ব থাকলেও ভাষার ক্ষেত্রে এদের আলাদা কোন গুরচত্ব নেই। তবে সাহিত্যে ও রচনায় ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য প্রথম বন্ধনী ব্যবহার করা হয়। যেমন-

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর রমনার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) পাকিস্তান বাংলাদেশের কাছে পরাজয় মেনে দলিলে স্বাক্ষর করে।

ব্যাকরণিক চিহ্ন

বিরাম চিহ্নের বাইরেও বাংলা ভাষায় কিছু চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এগুলো দিয়ে কোন বিরতি বা ছেদ বোঝানো হয় না। এগুলো ব্যাকরণের কতোগুলো টার্মস বোঝায়।

ব্যাকরণের বিভিন্ন তথ্য বা টার্মস বোঝাতে যেই চিহ্নগুলো ব্যবহৃত হয়, সেগুলোই ব্যাকরণিক চিহ্ন।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উলেলখযোগ্য কয়েকটি ব্যাকরণিক চিহ্ন হলো-

বোঝায়	চিহ্ন/ আকৃতি	উদাহরণ
ধাতু	√	√স্থা = স্থা ধাতু
পরবর্তী শব্দ হতে উৎপন্ন	<	জাঁদরেল < জেনারেল
পূর্ববর্তী শব্দ হতে উৎপন্ন	>	গঙ্গা > গাঙ
সমানবাচক বা সমস্তবাচক	=	নর ও নারী = নরনারী

বিরাম চিহ্নের ব্যবহার অনুশীলন

১. কমা (পাদচ্ছেদ): সাধারণত ১ (এক) উচ্চারণে যতটুকু সময় প্রয়োজন ততটুকু সময় থামতে হয় কমার জন্যে।

(ক) বাক্যের অর্থবিভাগ দেখানোর জন্য কমা ব্যবহৃত হয়। যেমন: সুখ চাও, সুখ পাবে পরিশ্রমে।

(খ) একাধিক বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ একসাথে বসলে শেষটি বাদে সবগুলোর পর কমা বসে। যেমন: জবা, বেলি, হাসনাহেনা আমার প্রিয় ফুল।

(গ) সম্বোধনের পর কমা বসে। যেমন: সুমন, এদিকে এসো।

(ঘ) উদ্ধরণ চিহ্নের পূর্বে কমা বসে। যেমন: শিক্ষক বললেন, "আগামীকাল হরতাল।"

(ঙ) বার ও মাসের পরে কমা বসে। যেমন: ১লা বৈশাখ, শনিবার, ১৪২২ সন।

২. সেমিকোলন (অর্ধচ্ছেদ): কমা অপেক্ষা বেশি বিরতির দরকার হলে সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন: আগে চেনা পথে যাও; পরে অচেনা পথে যেয়ো।

৩. দাঁড়ি (পূর্ণচ্ছেদ): বাক্যের পরিসমাপ্তি বোঝানোর জন্য দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়। যেমন: মৃত্যুতে সব অহংকার ধুয়ে মুছে যায়।

৪. বিস্ময় চিহ্ন (বিস্ময়সূচক চিহ্ন): অবাক, বিস্ময় বা হৃদয়াবেগ প্রকাশ পেলে বাক্যের শেষে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন: ছি ছি! তুই এতো নীচ।

৫. কোলন (দৃষ্টান্তচ্ছেদ): অপূর্ণ বাক্যের পরে একটি পূর্ণ বাক্য এলে কোলন চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন : প্রতিজ্ঞা করলাম : আর মিথ্যা বলবো না।

৬. ড্যাশ (বাক্যসঙ্গতি চিহ্ন): পৃথক ভাবাপন্ন দুই বা ততোধিক বাক্যের সমন্বয় বোঝাতে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন: শিশির– না, এ নামটা আর ব্যবহার করা চলিল না।

৭. কোলন ড্যাশ (ছেদ বাক্যসঙ্গতি চিহ্ন): উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত বোঝাতে কোলন এবং ড্যাশ একসাথে ব্যবহৃত হয়। যেমন: কাল তিন প্রকার :- অতীত কাল, বর্তমান কাল ও ভবিষ্যত্ কাল।

৮. হাইফেন (শব্দ সংযোগ চিহ্ন): সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দেখাবার জন্য হাইফেন ব্যবহার করা হয়। যেমন: এ আমাদের শ্রদ্ধা-অভিনন্দন, আমাদের প্রীতি-উপহার।

৯. লোপ চিহ্ন: কোনো বর্ণ বিশেষের লোপ বোঝাতে বিলুপ্ত বর্ণের জন্য এই লোপ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন: মাথার ’পরে জ্বলছে রবি (’পরে = ওপরে)। পাগড়ি বাঁধা যাচ্ছে কা’ রা? (কা’ রা = কাহারা)

১০. উদ্ধৃতি চিহ্ন: বক্তার বক্তব্য উক্তি এই চিহ্নের অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন: তিনি বললেন, “তোমরা চলে যাও। ”

১১. ব্র্যাকেট বা বন্ধনী চিহ্ন: এই তিনটি চিহ্নই প্রধানত গণিতে ব্যবহৃত হয়। তবে প্রথম বন্ধনীটি বিশেষ ব্যাখ্যামূলক অর্থ সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন: ত্রিপুরায় (বর্তমানে কুমিল্লা) তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

যথাস্থানে বিরাম চিহ্ন বসানোর কিছু উদাহরণ

প্রশ্ন: উঠানের শেষে তুলসী গাছটা আবার শুকিয়ে উঠেছে তার পাতায় খয়েরি রং সেদিন পুলিশ আসার পর থেকে কেউ তার গোড়ায় পানি দেয়নি সেদিন থেকে গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও আর কারো মনে পড়ে নি

উত্তর: উঠানের শেষে তুলসী গাছটা আবার শুকিয়ে উঠেছে। তার পাতায় খয়েরি রং। সেদিন পুলিশ আসার পর থেকে কেউ তার গোড়ায় পানি দেয় নি। সেদিন থেকে গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও আর কারো মনে পড়ে নি।

প্রশ্ন: রঙের খেলা খেলিতে খেলিতে তাহার উদয় রং ছড়াইতে ছড়াইতে তাহার অস্ত যৌবন সূর্য যেথায় অস্তমিত দুঃখের তিমির কুন্তলা নিশীথিনীর সেই তো লীলাভূমি

উত্তর: রঙের খেলা খেলিতে খেলিতে তাহার উদয় রং ছড়াইতে ছড়াইতে তাহার অস্ত। যৌবন-সূর্য যেথায় অস্তমিত, দুঃখের তিমির-কুন্তলা নিশীথিনীর সেই তো লীলাভূমি।

প্রশ্ন: আমি তাহার হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম হৈম আমার উপর রাগ করিয়ো না আমি তোমার সত্যে কখনো আঘাত করিব না আমি যে তোমার সত্যের বাঁধনে বাঁধা

উত্তর: আমি তাহার হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম, "হৈম আমার উপর রাগ করিয়ো না। আমি তোমার সত্যে কখনো আঘাত করিব না, আমি যে তোমার সত্যের বাঁধনে বাঁধা।"

প্রশ্ন: মা রাগ করিয়া বাবার কাছে তাঁহার বধূর মূঢ়তা এবং ততোধিক একগুঁয়েমির কথা বলিয়া দিলেন বাবা হৈমকে ডাকিয়া বলিলেন আই বড় মেয়ের বয়স সতেরো এটা কি খুব একটা গৌরবের কথা তাই ঢাক পিটিয়ে বেড়াইতে হইবে

উত্তর: মা রাগ করিয়া বাবার কাছে তাঁহার বধূর মূঢ়তা এবং ততোধিক একগুঁয়েমির কথা বলিয়া দিলেন। বাবা হৈমকে ডাকিয়া বলিলেন, "আই বড় মেয়ের বয়স সতেরো, এটা কি খুব একটা গৌরবের কথা, তাই ঢাক পিটিয়ে বেড়াইতে হইবে?"

প্রশ্ন: দিন কাটিয়া যায় জীবন অতিবাহিত হয় ঋতুচক্রে সময় পাক খায় পদ্মার ভাঙন ধরা তীরে মাটি ধসিতে থাকে পদ্মার জল ভেদ করিয়া জাগিয়া ওঠে চর অর্ধশতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়

উত্তর: দিন কাটিয়া যায়। জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, পদ্মার ভাঙ্গন-ধরা তীরে মাটি ধসিতে থাকে, পদ্মার জল ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠে চর, অর্ধ-শতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়।

প্রশ্ন: কমলাকান্ত জোড়হাত করিয়া বলিল বাবা কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি যে আমাকে এর ভিতর পুরিলে চাপরাশি মহাশয় কথাটা বুঝিলেন না ছড়ি ঘুরাইয়া বলিলেন তামাশার জায়গা এ নয় হলফ পড় কমলাকান্ত বলিল পড়াও না বাপু

উত্তর: কমলাকান্ত জোড়হাত করিয়া বলিল, "বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি যে, আমাকে এর ভিতর পুরিলে?" চাপরাশি মহাশয় কথাটা বুঝিলেন না। ছড়ি ঘুরাইয়া বলিলেন, "তামাশার জায়গা এ নয়– হলফ পড়।" কমলাকান্ত বলিল, "পড়াও না বাপু।"

প্রশ্ন: এবার হৈম ইশারার মানে বুঝিল স্বর আরো দৃঢ় করিয়া বলিল বাবা এমন কথা কখনোই বলিতে পারব না মা গলা চড়াইয়া বলিলেন তুই কি আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে চাস হৈম বলিল আমার বাবা তো কখনোই মিথ্যা বলেন না

উত্তর: এবার হৈম ইশারার মানে বুঝিল। স্বর আরো দৃঢ় করিয়া বলিল, "বাবা এমন কথা কখনোই বলিতে পারব না।" মা গলা চড়াইয়া বলিলেন, "তুই কি আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে চাস?" হৈম বলিল, "আমার বাবা তো কখনোই মিথ্যা বলেন না।"

প্রশ্ন: জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা আবার কোনো কোনো বেশরম বলে বাঙালির পয়সার অভাব বটে কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ কথা

উত্তর: জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা, আবার কোনো কোনো বেশরম বলে, "বাঙালির পয়সার অভাব।" বটে? কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ কথা।

প্রশ্ন: দুর্নীতি প্রতিরোধ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে ১৯৪৭ সালে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয় দুর্নীতি রোধ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে স্বাধীন গণমাধ্যম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য দলনিরপেক্ষ স্বাধীন ও সক্রিয় দুর্নীতি দমন কমিশন প্রয়োজন

উত্তর: দুর্নীতি প্রতিরোধ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ১৯৪৭ সালে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়। দুর্নীতি রোধ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে স্বাধীন গণমাধ্যম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য দলনিরপেক্ষ স্বাধীন ও সক্রিয় দুর্নীতি দমন কমিশন প্রয়োজন।

ভাষা কাকে বলে ? সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য দেখাও ।

ভাষার সংজ্ঞা : সাধারণভাবে বলা যায়,মনের ভাব প্রকাশের নিমিত্তে বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত অপরের বোধগম্য ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টির নাম ভাষা। অবশ্য উপরোক্ত সংজ্ঞা শুধু বাচনিক ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দেহ ও মুখের ভঙ্গি এবং নানা রকম সংকেতের মাধ্যমে ও আমরা মনোভাব প্রকাশ করি। এ রূপ ভাষাকে বলে অবাচনিক ভাষা।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, 'মানুষ যে সব ধ্বনি দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে তার নাম ভাষা।'
ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ' মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন ,কোন বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত,স্বতন্ত্রভাবে অবহিত তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দ সমষ্টিকে ভাষা বলে।'

সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য : প্রতিটি সমৃদ্ধ ভাষারই দুটি রূপ থাকে। সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনে এবং সার্বজনীন প্রয়োজনে বাংলা ভাষাকেও দু'টি রূপে রূপায়িত করা হয়েছে। যথা- (১) সাধু ও (২) চলিত।

ভাষার উদ্দেশ্য এক হলেও এদের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলো পরিলক্ষিত হয়-
১. সাধুভাষা লিখিতভাবে ভাব প্রকাশের সর্বজন স্বীকৃত সাধারণ রূপ। অপর পক্ষে, দেশের শিক্ষিত জনসমাজের পারস্পরিক ভাব বিনিময় ও কথোপকথনের উপযুক্ত বাহন হলো চলিত ভাষা।
২. সাধু ভাষা ব্যাকরণের সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত নিয়মের অনুসারী। কিন্তু চলিত ভাষা ব্যাকরণের সকল নিয়ম মেনে চলে না।
৩. সাধুভাষায় তৎসম শব্দের প্রয়োগ বেশি। অন্যদিকে,চলিত ভাষায় তদ্ভব,অর্ধতদ্ভব ও বিদেশী শব্দের প্রয়োগ বেশি।
৪. সাধু ভাষায় অপিনিহিত ও অভিশ্রুতির ব্যবহার নেই। চলিত রীতিতে এদের প্রয়োগ করা হয়।
৫. সাধু ভাষা অপরিবর্তনীয়। চলিত ভাষা পরিবর্তনীয়।
৬. সাধু ভাষা বেশ প্রাচীন। চলিত ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক।
৭.সাধুভাষায় সর্বনাম পদ পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়। চলিত রীতিতে সর্বনামগুলো সংকুচিত রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন- এ, সে, এরা, তারা ইত্যাদি।
৮. সাধু ভাষায় সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়াগুলো পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন- করিয়াছি,খাইয়াছি,পড়িয়াছি ইত্যাদি। চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদগুলো সংক্ষিপ্তভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন- করে,করেছি,পড়ে,পড়ছে ইত্যাদি।
৯. সাধভাষার পদ বিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্ধারিত। চলিত ভাষার পদ বিন্যাস সর্বদা সুনির্ধারিত নয়।
১০. সাধু ভাষা কৃত্রিম হলেও এটা সুষমামন্ডিত,গাম্ভীর্যপূর্ন ও আভিজাত্যের অধিকারী। চলিত ভাষা অপেক্ষাকৃত জীবন্ত লঘুগতি সম্পন্ন ও গণমানুষের ভাষা।
১১. সাধু ভাষায় হইতে, থাকিয়া, দিয়া ইত্যাদি অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়। চলিত রীতিতে অনুসর্গ সংকুচিত রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন- হয়ে,হতে,থেকে,দিয়ে ইত্যাদি।
১২. সাধু ভাষা সাধারণ কথাবার্তা,বক্তৃতা ও নাটকের সংলাপের উপযোগী নয়। চলিত ভাষা সাধারণ কথাবার্তা,বক্তৃতা,নাটকের ও সংলাপের উপযোগী।
১৩. সাধু ভাষা সাধারণ কথাবার্তার উপযোগী নয় এবং দুর্বোধ্য বলে ক্রমশ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে চলিত ভাষা নিত্য নতুন পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে ক্রমশ সমৃদ্ধ হচ্ছে।
১৪. সাধু ভাষা কোন অঞ্চল বিশেষের প্রভাবাধীন নয়। কিন্তু চলিত ভাষা আঞ্চলিক প্রভাবাধীন।
১৫. উদাহরণ- তাহারা বিষম ব্যথিত হইল। তারা বেশ ব্যাথা পেল।

প্রশ্ন: সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য আলোচনা করো।
উত্তর: সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য: বাংলা ভাষার দুটি রূপ–সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা। দুটি রূপের মধ্যে যেমন প্রকৃতিগত সাদৃশ্য রয়েছে, তেমনি পার্থক্যও রয়েছে। নিচে এ দুয়ের পার্থক্য আলোচনা করা হলো।
সাধু ভাষা চলিত ভাষা
১। যে ভাষায় সাধারণত সাহিত্য রচিত হয় এবং যা মার্জিত ও সর্বজনস্বীকৃত, তাই সাধু ভাষা। ১। শিক্ষিত লোক সাধারণ কথাবার্তায় যে ভাষা ব্যবহার করে থাকে, তা-ই চলিত ভাষা।

২। সাধু ভাষা ব্যাকরণের সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত নিয়মের অনুসারী। ২। চলিত ভাষার সুনির্ধারিত ব্যাকরণ আজও তৈরি হয়নি।

৩। সাধু ভাষা গুরুগম্ভীর ও আভিজাত্যের অধিকারী। ৩। চলিত ভাষা সহজ ও স্বাভাবিক। এ ভাষা মানুষের মনোভাব প্রকাশে উপযোগী।

৪। সাধু ভাষার কাঠামো সাধারণত অপরিবর্তনীয়। ৪। চলিত ভাষা পরিবর্তনশীল।

৫। সাধু ভাষা কৃত্রিম। ৫। চলিত ভাষা কৃত্রিমতা-বর্জিত।

৬। সাধু ভাষা নাটকের সংলাপ, আলাপ-আলোচনা ও বক্তৃতায় তেমন উপযোগী নয়। ৬। চলিত ভাষা নাটকের সংলাপ, আলাপ-আলোচনা ও বক্তৃতায় বেশ উপযোগী।

৭। সাধু ভাষায় ক্রিয়া ও সর্বনাম পদগুলো সাধারণত দীর্ঘ হয়ে থাকে। যেমন–খাইতেছি, তাহারা ইত্যাদি।

৭। চলিত ভাষায় ক্রিয়া এবং সর্বনাম পদগুলো সংক্ষিপ্ত। যেমন–খাচ্ছি, তারা ইত্যাদি।

৮। এ ভাষা প্রাচীন। ৮। এটি আধুনিক।

৯। সাধু ভাষায় তৎসম শব্দের প্রয়োগ বেশি। ৯। চলিত ভাষায় অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দের প্রয়োগ বেশি।

১০। সাধু ভাষায় অপনিহিত ও অভিশ্রুতির ব্যবহার নেই। ১০। চলিত ভাষায় এদের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

মোঃ রায়হান খান
কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ (সিএসই)
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল: raihankhancs@gmail.com